ISSN-0971-7153

জগতের ধাত্রী দুর্গার কথা

ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে- দেবী দুর্গা কেশরাশি সমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশোখরা, ত্রিনয়না, বদন পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর, বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় হরিদ্রাভ। তিনি সুচারুদশনা, ত্রিলোকে সুপ্রতিষ্ঠিতা, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব আভরণ ভূষিতা, পীনোন্নতপয়োধরা। তার বামজানু, কটি ও গ্রীবা কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গভাবে সংস্থাপিত। ——— লিখেছেন— **সর্বানন্দ মণ্ডল।**

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে নিজের নাম প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবী দুর্গা বলেছেন,— সেই সময় (শাকম্ভরী রূপে) আমি যখন 'দুর্গম' নামের মহাসুর বধ করব তখনই আমি 'দুর্গাদেবী' নামে খ্যাত হবো।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গামাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।। ১১/৫০

দুর্গা নামের উৎপত্তি অতি প্রাচীন। কৃষ্ণ যদুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদে 'দুর্গা' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাজ্ঞিকা উপনিষদে 'দুর্গি' শব্দের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতগণ দুর্গা ও দুর্গি শব্দ দুটিকে অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

দুর্গা শব্দটি বিশ্লেষণ করলে -দ্ + উ + র+ গ্ + আ— এই বর্ণগুলিকে পাওয়া যায়। তার স্বরূপের ব্যাখ্যা রয়েছে প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই।

শাস্ত্রবচনে বলা হয় 'দ' শব্দটি দৈত্যনাশক, 'উ' কার বিঘ্ননাশক, '/' (রেফ) ফলা রোগনাশক, 'গ'কার পাপনাশক এবং 'আ' কার ভয় ও শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ এবং ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। অথবা 'দুর্গ' শব্দটি বিপত্তিবাচক, 'আ'কার নাশবাচক অর্থাৎ যিনি বিপত্তিনাশক তিনিই দুর্গা। শাস্ত্র ও পুরাণে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে , রুরুদৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরকে বধ করে দেবী বিশ্বলোকে দুর্গা নামে — পরিচিতা হয়েছেন।

যাকে দুঃখের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বা জানা যায়, তিনিই দুর্গা। এখন দুর্গা শব্দই সচরাচর শোনা যায়, কিন্তু দুর্গি শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় না। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রীকে দুর্গি শব্দটি পাওয়া যায়। 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহী, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ' বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে দুর্গা ও দুর্গি অভেদ।

এখন প্রশ্ন হলো এই দুর্গা কে? দুর্গা সিংহবাহিনী। সিংহ পশুরাজ। আমাদের মনও পশু। এই মন যখন শক্তিশালী হয়, তখন সে হয় পশুরাজ। এই শুদ্ধ শক্তিশালী মনই অন্তরের অবিদ্যারূপী, অজ্ঞানরূপী পশুকে পরাভূত করতে সক্ষম। এ জন্যেই দেবী সিংহবাহিনী। এই দুর্গা মহিষাসুরের সাথে যুদ্ধে রত। মহিষাসুর অপ্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির প্রতীক, অবিদ্যা ও অজ্ঞানের প্রতীক। মানুষই এই মহিষাসুর। প্রথম জীবনে মানুষের মন থাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন, ভোগপ্রবণ, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর বশীভূত। এই মানুষকে হতে হবে দেবতা, ঘটাতে হবে তার মনের রূপান্তর। সাধককে আত্মজয়ী হওয়ার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। এই মানসিক রূপান্তর, এই দেবত্বলাভের যুদ্ধের জন্য যে সব প্রহরণ দরকার উহাই দেওয়া হয়েছে দেবীর হস্তসমূহে। দেবীর হাতে আছে— ত্রিশূল, খড়্গ, ধনু, অসি, কুঠার গদা, শর, ঢাল, পাশ, বজ্র, দণ্ড, শক্তি, চক্র, শঙ্খ, কমণ্ডলু, জপমালা, সুরাপাত্র বা সোমপাত্র প্রভৃতি।

তার নাম জপ করা, তার স্বরূপ চিন্তা করাও মানসিক একাগ্রতা সাধনের উপায়। সুতরাং জপমালা— ধর্মের প্রতীক। কমণ্ডলু সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীদের জলপাত্র, সুতরাং কমণ্ডলু বৈরাগ্যের প্রতীক। বৈরাগ্য এবং অনাশক্তি ছাড়া দুধর্ষ চঞ্চল মনকে জয় করা যায় না। দণ্ড দ্বারা শাসন করা হয়, অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করা হয়, সুতরাং দণ্ড সংযমের প্রতীক। ত্রিশূলের তিনটি শূল— সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতীক, সাধককে এই ত্রিগুণ জয় করতে হবে, ত্রিগুণকে স্ববশে রাখতে হবে। অতি মানস জ্ঞানজ্যোতিকে অন্তরে উন্মোষিত করতে হবে, গুণাতীত অবস্থা লাভ করতে হবে। ধনু, অসি, খড়্গ, কুঠার, বজ্র, চক্র প্রভৃতি সংহার অস্ত্র। অন্তরের অবিদ্যা ও অজ্ঞানকে, পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে সংহার করার জন্য সব সময়ের জন্য যুদ্ধার্থে তৈরি থাকতে হবে। যুদ্ধজয়ের পর আত্মস্বরূপের সুধা বা সোম পান করে সাধক হবে অমৃতের অধিকারী। এ জন্যেই দেবীর হাতে সুধাপাত্র।

দুর্গার সঙ্গে আছেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। অন্তরের পশুভাবকে, অবিদ্যাশক্তিকে জয় করতে পারলে সাধক হয় কার্তিকেয় দেবসেনাপতি, দেবশক্তির অধিপতি। জনগণকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেন। এজন্যেই হিন্দু সমাজে সাধু-মহাত্মাদের বলা হয় 'মহারাজ' জনগণ-অধিনায়ক সম্রাট- Emperor of Emperors.

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্ম দ্বারা শক্তি অভিব্যক্তি হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ, এটা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন। কল্পনার দ্বারা অগ্নি ও এর দাহিকাশক্তিকে আমরা পৃথক ভাবতে পারি কিন্তু আসলে পৃথক করতে পারি না।

এবার আসা যাক দেবী দুর্গার মূর্তি কল্পনায়। দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে তার মূর্তির বর্ণনা আছে। ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে- দেবী দুর্গা কেশরাশি সমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশোখরা, ত্রিনয়না, বদন পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর, বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় হরিদ্রাভ। তিনি সুচারুদশনা, ত্রিলোকে সুপ্রতিষ্ঠিতা, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব আভরণ ভূষিতা, পীনোন্নতপয়োধরা। তার বামজানু, কটি ও গ্রীবা কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গভাবে সংস্থাপিত। তিনি মহিষাসুরমর্দিনী এবং মৃণালের ন্যায় আয়ত্ত ও মিলিত দশবাহু সমন্বিতা। তার ডানদিকের পাঁচ হাতে ওপর থেকে নিচে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি শোভ পাচ্ছে। আর বামের পাঁচ হাতে ওপর থেকে নিচে খেটক, জ্যারোপিত ধনু, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘন্টা শোভিত। দেবীর পদতলে ছিন্ন স্কন্ধ মহিষ এবং উক্ত মহিষের স্কন্ধদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে খড়্গ পাণি এক দানব তথা মহিষাসুর। দেবী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শূল মহিষাসুরের হৃদয় বিদীর্ণ ও রক্তাক্ত করেছে। দেবী নাগপাশ যুক্ত হাতে অসুরের কেশাগ্র ধারণ করেছেন। নাগ সেই অসুরকে বেষ্টন করে আছে।

দেবী মূর্তির দক্ষিণে লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বামে সরস্বতী ও কার্তিকেয় অধিষ্ঠিত আছেন। দেবী উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা নামক অষ্টশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিতা। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলদাত্রী এবং জগদ্ধাত্রী।

বৈদিক যুগেও দেবীর এইরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায় - কেনোপনিষদের ঋষির চোখে বহু পূর্বে সুরলোকে দেবাসুর সংগ্রামে গর্বিত দেবতাদের সম্মুখে 'উমা' 'হৈমবতী' রূপে তার প্রথম প্রকাশ।

শক্তি সচেতন বায়ু , অগ্নি প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মপুরুষের সামনে শক্তি প্রদানে যখন ব্যর্থ, তখনই হঠাৎ নীল আকাশের বুকে বিদ্যুৎ বর্ণা উমার আবির্ভাব—

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম।
বহু শোভমানাম্ উমাম্ হৈমবতীম্।।

এই দেবী ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে ঋক্‌মন্ত্রে আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন।

'অহংরুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্.....'।

দুর্গা -সপ্তদশী বা দেবী মাহাত্ম্য মূলত বেদভিত্তিক। এর তিনটি চরিত্রের প্রথমটি ঋক্‌বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্রটি যদুর্বেদস্বরূপা, উত্তর চরিত্রটি সামবেদস্বরূপা।

বাল্মীকি রামায়ণে শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা উল্লেখ না থাকলেও কৃত্তিবাস তার বাংলা রামায়ণে দেবী দুর্গার আবাহনের ঘটনাটি কারণসহ তুলে ধরেছেন। কিন্তু না, তা

কৃত্তিবাসের কপোল কল্পিত নয়। কারণ এই ঘটনাটির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন দেবীর বোধন পূজায় এই মন্ত্রটি — 'ওঁ শ্রীঁ রাবণস্য বধার্থায়, রামস্যানুগ্রহায় চ.....'। বৃহন্নারদীয় পুরাণে সেই দেবী উমা, শক্তি ও লক্ষ্মী ইত্যাদি নামে উক্ত হয়েছেন— ' উমেতি কেচিদাহুস্তাম্, শক্তি লক্ষ্মীংতথাপরে.....।

দেবীতত্ত্বের সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। চণ্ডীতে দেবীচরিত্র প্রথম, মধ্যম ও উত্তর এই তিনভাগে বিভক্ত। মধু- কৈটভ বধের কাহিনি নিয়ে প্রথম চরিত্র, মহিষাসুর বধের বৃত্তান্ত নিয়ে দেবীর মধ্যম চরিত্র এবং শুম্ভ- নিশুম্ভের বধের কাহিনি নিয়ে দেবীর উত্তর চরিত্র রচিত হয়েছে।

প্রথম চরিত্রে দেবীর ভূমিকা পরোক্ষ। কম্পান্তে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। প্রলয় পরবর্তী যুগে নবসৃষ্টির ব্যাকুলতায় তিনি অপেক্ষা রত। কিন্তু নিদ্রামগ্ন হরির কর্ণমূল হতে জাত মধু-কৈটভ ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে সমুদ্যত হল। হরির যোগনিদ্রা কে ভঙ্গ করবে? দুর্ধর্ষ অসুরদ্বয়কেই বা কে বিনাশ করবে ? ব্রহ্মা দেবীর স্তবে নিমগ্ন হলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী মধু-কৈটভের বিনাশার্থে এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করার জন্যে বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, বাহু, নাসিকা, হৃদয় ও ব্রহ্মস্থল হতে নির্গত হয়ে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করে দেবী বিষ্ণুকে মধু-কৈটভ বধে প্রবুদ্ধ করলেন আর মধু-কৈটভকে অভিভূত করলেন কালনিদ্রায়।

মধ্যম চরিত্রে দেবী স্বীয় হস্তে দুরাত্মা মহিষাসুরকে বধ করেন। মহিষাসুর দেবগণকে পরাজিত করে দেব্যরাজ অধিকার করেছিল। পরাজিত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে বিষ্ণু ও শঙ্কর সমীপে উপনীত হলেন। মহিষাসুরের বিক্রম ও দেববিদ্বেষমূলক কার্যাবলি শ্রবণে বিষ্ণু ও শিব ক্রুদ্ধ হলেন। তাদের মুখ থেকে এবং অন্যান্য দেবগণের শরীর থেকে মহাতেজ নির্গত হতে থাকে। পর্বতসম সেই সম্মিলিত তেজোরশ্মি থেকে আবির্ভূতা হন এক নারীমূর্তি। সেই সংহত দেবশক্তিই দুর্গা।

দেব অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে দেবী স্বহস্তে মহিষাসুরকে বধ করে দেবগণকে স্বর্গরাজ্যে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন।

শেষ চরিত্রে দেবী মহাসরস্বতীরূপে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি অনুচর ও সেনাপতিসহ শুম্ভ- নিশুম্ভ নামক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরদ্বয়কে বধ করেন। মহিষাসুরের ন্যায় শুম্ভ-নিশুম্ভও দেবগণকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্যে ব্যাপক উৎপীড়ন শুরু করেছিলেন।

পণ্ডিতগণের মতে মধু-কৈটভ তামসিক অহংকারের, মহিষাসুর রাজসিক অহংকারের এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ সাত্ত্বিক অহংকারের প্রতীক। এই ত্রিগুণ শরীরী সর্বদা আমাদের ভিতরেই বাস করছে।

দেবীর কৃপাধন্য হতে হলে শ্রান্তিহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই তিনটি অসুরকে সংহার করতে হবে।

ইতিহাসও দুর্গা সম্বন্ধে বাঙ্ময় ছিল। মহাভারতে একাধিকবার দুর্গা স্মরণের উল্লেখ আছে। অজ্ঞাতবাসের সাফল্যের জন্য বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গার স্বরচিত স্তব পাঠ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধজয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন (স্বরচিত) দুর্গার স্তোত্র পাঠ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ব্রজবালারা ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী কাত্যায়নী দুর্গার কাছে তাদের কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধা ঋষির স্তুতিতে পাওয়া যায়--- 'দেবী , আপনি সর্বকার্য ও কারণ স্বরূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী দুর্জ্ঞেয়। সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে .....'। ইনি (দেবী) সর্বজ্ঞা ও সর্বস্থিতা (She is omniscient and Omnipresent).

দেবতাদের স্তুতিতে এই চিচ্ছক্তি, চেতনা , বুদ্ধি -নিদ্রা- ক্ষুধা- ছায়া - শক্তি- তৃষ্ণা- ক্ষান্তি- জাতি- লজ্জা- শান্তি- শ্রদ্ধা- কান্তি- লক্ষ্মী- বৃত্তি- স্মৃতি- দয়া- মাতা- তুষ্টি- ভ্রান্তিরূপে সর্বজীবে বিরাজমানা।

'যা দেবী সর্বভূতেষু.....'।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে প্রাকৃতিক নয়টি ভেষজে ব্রহ্মাণী প্রমুখ নয়টি দেবীর অবস্থান। সম্মিলিতরূপে যিনি নবপত্রিকা (কলা বউ) বাসিনী নবদুর্গারূপে খ্যাতা। আবার দেবীর ধ্যানে (জটাজুট সমাযুক্তাং.....)-র একেবারে শেষভাগে বলা হয়েছে । উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রমুখ অষ্টশক্তিগণে যিনি সর্বদা পরিবেষ্টিতা সেই ধর্ম- অর্থ- কাম- মোক্ষদাত্রী জগতের ধাত্রী সর্বদা চিন্তনীয়া। এই অষ্টশক্তি পরিবৃতা ভগবতী নবদুর্গারূপে প্রকাশমানা।

দুর্গাপূজা প্রাচীন বৈদিক সোমযাগেরই একটি রূপ বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদে দুর্গি শব্দের প্রয়োগ পাই- দুর্গা অর্থাৎ বাধার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি, তাই দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গা। প্রাচীন বৈদিক যুগে আদিত্য মণ্ডলের অয়নকে লক্ষ্য করেই উৎসব পালন করা হত। আদিত্যের দুটি অয়ন- উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে আলো ক্রমশ: বেড়েই চলে এবং দক্ষিণায়নে আলো হ্রাসের দিকে। অধ্যাত্ম সাধনার দিক থেকে এই দুটি অয়নই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সাধকের জীবন শুদ্ধ হবে আলোর চেতনায় এবং ক্রমশ: উজিয়ে যাবে উত্তরায়ণের শিরোবিন্দুতে। একেই বলে বিষুব। যখন দিনের ক্রান্তি ও রাতের আলো সমান থাকে তাকেই বলে বাসন্তী বিষুব - এই সময়েই বাসন্তী পূজা হয়। এই বাসন্তী পূজাই দুর্গাপূজা। তারপর আলো ক্রমশ: কমে আসে। উত্তর এবং দক্ষিণায়নের মাঝখানে আর একটি বিষুব উত্তর এবং দক্ষিণায়নের মাঝখানে আর একটি বিষুব পাই শরতের আশ্বিন মাসে। এই সময় শক্তি জাগিয়ে রাখতে হয়, আর তাকে হ্রাসের দিকে যেতে দেব না এই হয় সাধকের চেষ্টা। তাই এখানে সাধককে শক্তিরূপে আবার জাগাতে হয় । তাই এই অকালবোধন। সাধারণত: বাংলাদেশে যে দুর্গোৎসব হয় সেটা এই সময়েই হয়, তাই একে অকালবোধন বলে।

এখন দেখা যাক তন্ত্রের দৃষ্টিতে দেবী কেমন। বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে দেবী প্রকৃত অর্থেই ত্রাণকর্ত্রী, এখানে বলেছে, 'তুমি (দেবী) নিরাশ্রয়, দীন, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্থ, ভিত ও বদ্ধজীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। মুণ্ডমালা তন্ত্রে দেবীর পরস্পর বিরোধী চরিত্র তথা রূপগুলি দেখা যায়। এখানে তিনি সাকারা আবার নিরাকারাও, অব্যক্তা আবার ব্যক্তরূপাও ভগবান শঙ্করই (শিব) যার একমাত্র আরাধ্য দেবতা সেই শিবগত প্রাণ আচার্য শঙ্কর (শঙ্করাচার্য) তার দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র দেবীর উদ্দেশ্যে বলছেন , '..... এখনও যদি আমার প্রতি দয়া না কর হে লম্বোদর জননী , নিরাশ্রয় আমি আর কার শরণ নেব? '..... নিরালম্বো লম্বোদর জননী কংযামি শরণম্'।

রাজা সুরথ নিজ অমাত্যবর্গের দ্বারা ষড়যন্ত্রে রাজচ্যুত হয়েছিলেন আর সমাধি বৈশ্য তার স্ত্রী-পুত্রের ধনলোভে গৃহ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখ আছে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস্ মুনির উপদেশ অনুসারে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে নিজ গাত্র- রক্ত বলিদান পূর্বক তিন বছর ধরে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। দেবী প্রসন্না হয়ে উভয়কে দর্শন দান পূর্বক বরদান করতে চাইলে রাজা সুরথ দেবীর কাছে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার আর সমাধি বৈশ্য চান তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য পূজা করেছিলেন বসন্তকালে - যা বাংলায় বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত।

রাবণের কুলদেবতা ছিলেন স্বয়ং মহেশ্বরী ফলে রাবণ ছিল অবধ্য। শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মার উপদেশে লঙ্কাজয়ের মানসে শরৎকালে দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন যা আমরা সাড়ম্বরে শারদীয়া দুর্গাপূজারূপে পালন করি। বৃহন্নান্দিকেশ্বর পুরাণ, দেবী পুরাণ , কালিকাপুরাণ, সাধারণত: এই তিনের যে কোনও একটি মতে বাংলায় ও তার আশেপাশের রাজ্যে বাসন্তী বা শারদীয়া দুর্গাপূজা হয়ে থাকে।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন দেবীকে দেখেছিলেন বাঙালি ঘরের একেবারে আটপৌরে কন্যার চোখে। তার আগমনী গানে লিখলেন - 'এবার উমা এলে আর উমাকে পাঠাব না.....'।

একইভাবে কবি কাজী নজরুল ইসলাম গাইলেন, 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে, জননী তোর উদ্বোধন, নিত্যা হয়ে রইবে ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন.....'।

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র দেশমাতৃকাতে বিশ্বমাতৃকার (দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার) রূপ আরোপ করেছেন — 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'।। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'। ঋষি অরবিন্দ দেশের ঘোর সঙ্কটকালে দেবীকে প্রার্থনা জানালেন কাতরভাবে 'মাত: দুর্গে! স্মার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসংকল্প কর। আর নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ে ভিত যেন না হই'।

আবার প্রাত:স্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা চেতনায় জগদম্বা গর্ভধারিণী তথা সমগ্র মাতৃজাতির মধ্যেই অন্তর্লীনা।

দুর্গাভাবনা: বেদ থেকে বর্তমান প্রসঙ্গে, যে দেবী প্রথমে নীলবর্ণ আকাশের বুকে বিদ্যুৎবর্ণা (তেজ:পুঞ্জ) নিজেকে প্রকট করেছিলেন মাত্র। ক্রমে ক্রমে পুরাণতন্ত্রে যার মুখ- হাত- পা (ক্রিয়াকলাপ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পেল। বর্তমান কবি- সাহিত্যিক সাধকগণের লেখনিতে (ভাবনায়) তিনিই আমাদের একান্ত আপন উমারূপী কন্যা। ক্রমে তার পূর্ণতা ঘটল বঙ্কিম কলমে দেশমাতৃকারূপিণী সৃষ্টি -স্থিতি- সংহারকারিণী 'দেবী দুর্গা'।